শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট হলেন বামপন্থী অনূঢ়া কুমার দিশানায়েকে

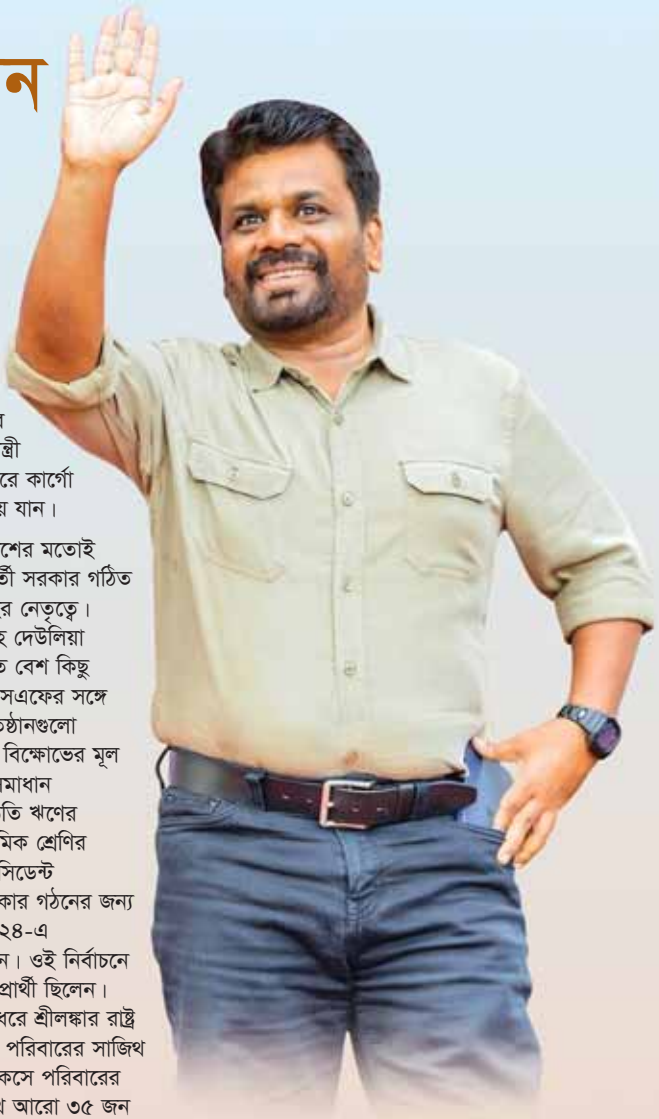

মাহবুব আলম

রঙবেরঙের আগস্ট ২০২৪ সংখ্যায় 'উত্তাল অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থান' শীর্ষক এক নিবন্ধনের শুরুতেই লিখেছিলাম– ছাত্র আন্দোলন বারবার বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ। ক্ষমতাসীন শাসকরা কিছুই করতে পারেনি। মাথা ঝোঁকাতে হয়েছে তাদের। '৫২, '৬২, '৬৯, '৭১ এবং ২০১৮ তার প্রমাণ। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুই বছরের মাথায় '৫৪ সালে নির্বাচনে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় পাকিস্তান আন্দোলনের বিপুল জনপ্রিয় দল মুসলিম লীগ।

'৬২-র ছাত্র আন্দোলন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় তৎকালীন সামরিক শাসকদের। '৬৯-র ছাত্র আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। বিদায় নেয় পাকিস্তানের লৌহমানব খ্যাত আইয়ুব খান। '৭১-র ছাত্র আন্দোলনে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ৯১-র ছাত্র গণঅভ্যুত্থান এরশাদ স্বৈরাচারের পতন হয়। ২০১৮-র নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও কোটা সংস্কার আন্দোলনে সরকার মাথার ঝোঁকাতে বাধ্য হয়। সর্বশেষ ২০২৪-র কোটা সংস্কার আন্দোলনে আয়রন লেডি খ্যাত শেখ হাসিনা ক্ষমতার মসনদ থেকে উৎখাত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। আর এই জন্যই তো বলা হয় ছাত্র আন্দোলন বারবার বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে– ছাত্র আন্দোলন শুধু বাংলাদেশকেই বদলে দিচ্ছে না। বদলে দিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশ। এর সর্বশেষ প্রমাণ শ্রীলংকা।

মাত্র দুই বছর আগে রাজা পাকসে পরিবারের অবাধ লুটপাটে দেওলিয়া শ্রীলংকার ছাত্র আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজা পাকসে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। তার ভাই প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দ্রা রাজা পাকসে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন থেকে পালিয়ে একটি হেলিকপ্টারে করে প্রথমে নেভাল শিপে আশ্রয় গ্রহণ করেন জীবন বাঁচাতে। পরে দেশ ছেড়ে সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমান। আর হাজার হাজার ছাত্র জনতা রাষ্ট্রপতি ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দখল করে আনন্দ উল্লাস করে প্রেসিডেন্টের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটে, রান্নাঘরে ঢুকে রাষ্ট্রপতির জন্য তৈরি সুস্বাদু খাবার ভাগাভাগি করে খায়। সেই সাথে সেলফি তুলে দেশবাসীকে জানান দেয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এখন তাদের দখলে। তারাও এসে ঘুরে দেখতে পারেন। ঠিক যেমনটা হয়েছিল ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে। এখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, প্রধানমন্ত্রী প্রথমে হেলিকপ্টারে পরে কার্গো বিমানে ভারতে পালিয়ে যান।

দু'বছর আগে বাংলাদেশের মতোই শ্রীলঙ্কায় একটি অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয় রনিল বিক্রমসিংহের নেতৃত্বে। প্রেসিডেন্ট বিক্রমসিংহে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কাকে টেনে তুলতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন। আইএসএফের সঙ্গে চুক্তি করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করেন। কিন্তু বিক্ষোভের মূল কারণগুলোর কোনো সমাধান করেননি। উপরন্তু বাড়তি ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেন শ্রমিক শ্রেণির উপর। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বিক্রমসিংহে স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন। ওই নির্বাচনে তিনি নিজেও একজন প্রার্থী ছিলেন। প্রার্থী ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী দুই পরিবারের সাজিথ প্রেমাদাসা ও রাজা পাকসে পরিবারের এক নেতা। সেই সাথে আরো ৩৫ জন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে পরিবারতন্ত্রকে ধসিয়ে দিয়ে চমক দেখালেন শ্রীলঙ্কার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি– জনতা বিমুক্তি পেরামুনা– জেভিপি নেতা অনূঢ়া কুমার দিশানায়েকে। ৫৫ বছরের এক যুবক তুখোড় সাবেক ছাত্রনেতা বৃহত্তর জোট গঠন করে ৪২ দশমিক ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে পেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমাদাসা পেয়েছেন ৩২ দশমিক ৭৬ শতাংশ ভোট। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর দিন ২৩ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। এ যেন একেবারে জিরো থেকে হিরো। সত্যিই তাই। অনূঢ়া কুমার দিশানায়েকে ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে মাত্র ৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ওই সময় পার্লামেন্টের ২২৫ আসনের মধ্যে তার দল মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয়। ২০১৯ থেকে ২০২৪ মাত্র ৫ বছর। এই ৫ বছরে জেভিপির ভোট বৃদ্ধি রীতিমতো আলাদ্দিনের চেরাগ প্রাপ্তির মতো। কিন্তু বিষয়টা আসলে মোটেও তা নয়। জেভিপির ভোট বৃদ্ধি বা জন সমর্থন বেড়েছে ২২ সালে ছাত্র আন্দোলনে। যে আন্দোলনে ছাত্ররা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ভবন দখল করে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করে। সেই আন্দোলনের অগ্রভাগের নেতৃত্ব ছিল ওই জেডিপির ছাত্র সংগঠন। তারপর দীর্ঘ দুই বছরে লাগাতার আন্দোলন করে গেছে পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

এখন প্রশ্ন হলো– নির্বাচনে জেভিপি জোট করল কাদের সাথে? জোট করল ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) নামের একটি বামপন্থী দলসহ ভারত বিরোধী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ ও সংগঠনের সঙ্গে। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ, সামরিক ব্যক্তি, শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও। শুধু তাই নয়, এক সময় যাদের শ্রেণিশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবারের নির্বাচনে তাদেরকেও ঐক্যে শামিল করে। সেই সাথে অনূঢ়া ঘোষণা দেন তিনি পরিবারতন্ত্র ভাঙবেনই। ভাঙতেই হবে। আর দুর্নীতি মূলোৎপাটন করে ছাড়বেন। অনূঢ়ার কথায় মানুষ আস্থা পেয়েছে। আস্থা রেখেছে। কারণ দল

হিসাবে তাদের নেতাকর্মীরা যে সৎ ও জনগণের প্রতি আস্থাশীল এটা অতীতে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তার চাইতেও বড় বিষয় হলো– অনূঢ়ার নেতৃত্বের গুণাবলী। তাছাড়া অনূঢ়ার দল এর আগে দু একবার কোয়ালিশনের শরীক হয়ে ক্ষমতায় গেছে। সেই সময় জেভিপি মন্ত্রিরা প্রমাণ করছে তারা সৎ ও অযোগ্য।

এ বিষয়ে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ আনতে চাই। ২০০৫ সালে যশোরে অনুষ্ঠিত ওয়াকার্স পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে অতিথি হিসেবে যোগদেন জেভিপির এক নেতা বিমল রত্নায়েকে। ছয় দিনব্যাপী এই প্রোগ্রাম উপলক্ষে তিনি ৮ দিন বাংলাদেশ ছিলেন। এ সময় আমি তাকে নিয়ে রিকশায় করে সদরঘাট, ইসলামপুর, লালবাগসহ পুরো ঢাকা ঘুরিয়েছিলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে একটা সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম। সেই সময় তিনি ছিলেন শ্রীলংকার কৃষি ও পশুপালন প্রতিমন্ত্রী। ওই সাক্ষাৎকারে আমার তৎকালীন 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সাক্ষাৎকারে শিরোনাম ছিল 'শ্রীলংকার বামপন্থীরা প্রমাণ করেছে তারা অন্যরকম, তারা সৎ'।

ওই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, প্রচণ্ড দমন পীড়ন নির্যাতন সহ্য করে তাদের পার্টি করতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে তৎকালীন সরকার বলে যে, আমরা চে'র অনুসারী, অস্ত্রধারী বিপজ্জনক। আমরা অবশ্য সশস্ত্র প্রতিরোধ করেছিলাম। এতে আমাদের অনেক নেতাকর্মীর মৃত্যু হয়। '৭৭ সালে আর একবার আমাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে জয়বর্ধন সরকার। পরে অবশ্য আমরা সশস্ত্র প্রতিরোধ স্থগিত করে ১৯৮১ সালে পার্টি রেজিস্ট্রেশন করি। কিন্তু ওই সশস্ত্র প্রতিরোধের সময় আমরা ৬০ হাজার নেতাকর্মী হারিয়েছি। তারপরও টিকে আছি। জনগণের আস্থা অর্জন করেছি। কিন্তু দুঃখজনক '৮৭ সালে আবারও সেনাবাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করে। এতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। আমরা তখন প্রতিরোধ নয়, বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়ে লড়াই করি। অবশ্য এই বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমাদের প্রায় সকল শীর্ষ নেতৃত্ব নিহত হয়। এই হলো সংক্ষেপে জেভিপি জনতা বিমুক্তি পেরামুনা।

বিদ্রোহী থেকে জনপ্রিয় নেতা

১৯৬৮ সালে গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণকারী অনূঢ়া দিশানায়েকে ফেলানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক। তিনি স্কুল জীবনেই জেভিপির সঙ্গে জড়িত হন। একজন বিদ্রোহী হিসাবে অস্ত্রহাতে সাহসী লড়াইও করেছেন আশির দশকের শেষ দিকে। ২০১৪ সালে তিনি জেভিপির নেতৃত্বে আসেন। ২০০০ সালে তিনি প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৪ সালে কৃষি প্রাণিসম্পদ ভূমি ও প্রতিমন্ত্রী এবং ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী হুইপ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রায় এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী

অবস্থানে আসেন। সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে পড়েছেন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে

১. ২২-র গণঅভ্যুত্থানে ব্যবস্থার পরিবর্তনের যে দাবি তিনি ও তার দল সামনে এনেছিলেন তা বাস্তবায়ন করা।
২. ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের সীমারেখা নির্ণয় করা। কারণ তিনি ও তার দল চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত।
৩. জ্বালানি সংকট মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ।
৪. পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। তা না হলে সংস্কারের সব আশা ভেস্তে যাবে।
৫. গ্রামীণ ভোটারদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে জরুরি ত্রাণের প্রত্যাশা পূরণ।
৬. অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে জনপ্রত্যাশা পূরণ।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রথম ভাষণে দিশানায়েকে বলেছেন, তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। অবশ্যই এজন্য সময় লাগবে। তবে অবশ্যই তিনি দেশের পরিবর্তন করবেন। এ কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি শপথ নিয়েই একটি অন্তবর্তী মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অধ্যাপক হরিনি অমরসুরিয়া এমপিকে বেছে নিয়েছেন। তার এই বাছাইয়ের ফলে হরিনি অমরসুরিয়া হলেন শ্রীলংকার ইতিহাসে তৃতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে অনূঢ়া পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে আগামী ১৪ নভেম্বর নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন।

পশ্চিমা গণমাধ্যমসহ বাংলাদেশ ও ভারতের গণমাধ্যমে যখন বলা হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে বামপন্থা প্রত্যাখ্যান হচ্ছে। বামপন্থা অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে তখন শ্রীলঙ্কায় বামপন্থীদের এই জয় এক অনন্য ঘটনা। এই ঘটনায় আবারো প্রমাণিত হলো– পশ্চিমা প্রোপাগান্ডায় মানুষ কান দিচ্ছে না। মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতায়, জীবনের বাস্তবতায় বুঝে যাচ্ছে বামপন্থার ক্ষয় নাই। শেষ পর্যন্ত বামপন্থীরাই জয় হবে। আর তাই তো শ্রীলঙ্কায় জনগণ বামপন্থাকে বেছে নিয়েছে। বেছে নিয়েছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাবেক গেরিলা নেতাকে। যিনি অস্ত্র হাতে জীবন বাজি রেখে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। লড়াই করেছেন রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে বিপ্লবের লক্ষ্যে। অস্ত্র হাতে লড়াইয়ে বারবার ব্যর্থ হলেও এবার তিনি ব্যালট যুদ্ধে ব্যর্থ হননি। ব্যালটে জয়ী হয়েছেন। ঠিক যেমনটা হয়েছে ল্যাটিন দেশ কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল, কোস্টারিকাসহ অন্যান্য দেশে। এমনকি বাড়ির পাশের দেশ নেপালে। নেপাল ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মতো শ্রীলঙ্কায় জনগণ আস্থা রেখেছে বামপন্থায়। আর এই বামপন্থীতেই বাজিমাত করেছেন অনূঢ়া দিশানায়েকে। তিনি তার নির্বাচনের জনসভায় মানুষকে সমতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বলেছেন, তার রাজনীতি ক্ষমতার জন্য নয়, তার রাজনীতি সমাজের শোষিত বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের জন্য লড়াই। তার এই সংকল্প তাকে অন্য প্রার্থীদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। সর্বোপরি তার দুর্নীতিবিরোধী লাগাতার অবস্থান।

দিশানায়েকেক নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কোনো ধনী বা ক্ষমতাশালী পরিবারেও সদস্য নন। যা তাকে অনেক ভোটারের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। তবে নিঃসন্দেহে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আগামী দিনে তিনি কতটা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবেন। অবশ্য এজন্য অপেক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তারপরও সকালের সূর্য দেখে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে। তিনি নির্বাচিত হয়েই বলেছেন, শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যতের স্থিতিশীলতার জন্য আইএমএফ চুক্তির পুনর্বিবেচনা অপরিহার্য। তার সাথে সাথে আরো বলেছেন, অভিজাততন্ত্র বিরোধিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তিনি অব্যাহত রাখবেন, এটা তার প্রতিজ্ঞা। তবে তিনি ব্যক্তিগত খাতকে প্রবৃদ্ধির চালক হিসাবে দাঁড় করার উপর জোর দিয়ে একটি বাণিজ্য সহায়ক পদ্ধতির কথাও বলেছেন। যা কিনা সমাজতান্ত্রিক চীন করছে অনেকদিন ধরে। এ বিষয়ে একাধিক মহল মনে করেছেন, তিনি নতুন ধরনের বামপন্থার জন্ম দিতে চলেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, তিনি পুরানো বন্দোবস্ত বাতিল করে নতুন বন্দোবস্ত করবেন। কর হ্রাস করে নিত্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনবেন। এবং সত্যিই যদি তিনি তা করেন, করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমনে ব্যবস্থা নিতে সমর্থ হন তাহলে গৃহযুদ্ধ ক্লান্ত শ্রীলঙ্কার স্বস্তি ফিরে আসবে। সেই সঙ্গে কুলীন রাজনীতিকদের বিশ্বাসঘাতকতার একটা যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। এটা হলে নবনির্বাচিত বামপন্থী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শ্রীলংকার রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখতে পারবেন। এটাই প্রত্যাশা শ্রীলঙ্কার বিক্ষোভ অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাসহ সমগ্র দেশবাসীর। আর তাইতো তারা আস্থা রেখেছেন লাল ঝাণ্ডায়।